সঙ্গপ্রসঙ্গ

# স্বামী ভূতেশানন্দ : এক আদর্শ সন্ন্যাসী

## স্বামী গৌতমানন্দ

পরমপূজনীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

প্রথম যখন পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজকে দেখি ১৯৬৩ সালে, তখন আমি দিল্লিতে, চৈতন্যাখ্য ব্রহ্মচারী। তিনি তখন রাজকোটের মোহন্ত। বড় একটি দল নিয়ে ট্রেনে সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে গুজরাত থেকে দিল্লি হয়ে বেলুড় মঠে আসছেন। আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছি। সেই প্রথমবার তাঁকে আমার দর্শন। আশ্চর্য হলাম! একজন মোহন্ত মহারাজ সেকেন্ড ক্লাসে যাট-সত্তর জনেরও বেশি ভক্তের সঙ্গে অতি সাবলীলভাবে বসে আসছেন! এমন সরলতা তখনও দেখিনি, তারপরেও সারাজীবনে দেখিনি।

আলং আর অরুণাচলপ্রদেশে আমি তেরো বছর ছিলাম, ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত। ওই সময় দুজন প্রেসিডেন্ট মহারাজ ওখানে যান : স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, তারপর স্বামী ভূতেশানন্দজী। বীরেশ্বরানন্দজীকে কলকাতা থেকে কিছুদূরে এনে তারপর হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু ভূতেশানন্দজীর সময় বায়ুদূত বলে একটা এয়ারলাইন আরম্ভ হয়েছিল। ল্যান্ড করতে করতে যাবে কিন্তু কলকাতা থেকে এক উড়ানে আলং যাওয়া যাবে বলে মহারাজ তাতে এলেন। তাঁর কলকাতা ফেরার পরেই বায়ুদূত বন্ধ হয়ে গেল। হয়তো মহারাজের জন্যই চালু হয়েছিল! যাইহোক মহারাজ ওখানে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার্থীদের অনেকে বাঙালি, তাঁরা সবাই ডিসট্রিক্ট ডি পি টি সি অফিসে কাজ করেন। অবশ্য উপজাতীয়রাও দীক্ষা নিল। যখন তিনি আলং-এ ছিলেন তখন একটি

।৭।

এগারো-বারো বছরের মেয়ে দীক্ষার্থী হয়ে এল। মহারাজ ইন্টারভিউ নিলেন এবং তাঁর সচিব নিত্যমুক্তানন্দজী বললেন, "এক-দু বছর পরে হবে, এখন না।" শুনে তারা চলে গেল কিন্তু কিছুক্ষণ পর বাবা-মা-র সঙ্গে সে আবার এল কান্নাকাটি করতে করতে। তখন নিত্যমুক্তানন্দজী একটি উপায় বার করলেন—আর একবার মহারাজের সঙ্গে তাকে দেখা করাবেন বললেন। প্রথমবার মেয়েটি শাড়ি পরেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বার পরে এল স্কুলড্রেস। তখন মহারাজ নিত্যমুক্তানন্দজীকে বললেন, "আরে আরে এ তো ছোট বাচ্চা, একে আবার নিয়ে এলে কেন?" তার সেবার দীক্ষা হল না।

অরুণাচল প্রদেশে মিথুন নামে একটি পশু আছে। বিরাট—ডাবল সাইজের মোষের মতো দেখতে। কিংবা দেখলে বিশাল একটা হাতি মনে হয়। একটা মিথুন কাটলে একশো কেজি মাংস হয়, গোটা একটা গ্রাম মিলে খায়। মিথুন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও বসে না। ভূতেশানন্দজী বললেন, "আমি অরুণাচল প্রদেশে এসেছি, আমাকে মিথুন দেখতে হবে।" সে এক বিরাট কাণ্ড! মিথুন তো জঙ্গলে থাকে, সে ঘুরতে ঘুরতে ক্যাম্পাসে এলে তবে তাকে দেখা যাবে। আমরা কয়েকজনকে বললাম, "তোমরা কোনওরকমে একটা মিথুন ধরে নিয়ে আসবে? মহারাজকে দেখাব।" এরই মধ্যে হয়েছে কী, ভোর পাঁচটায় একটা মিথুন আমাদের ক্যাম্পাসে ঢুকে আমাদের জঙ্গলে যা যা আছে খেয়েদেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন নিত্যমুক্তানন্দজী ও অন্যান্য সেবকরা তাকে দেখেছেন। কিন্তু মহারাজ সেই সময়ে আমাদের ঘরের পিছনে একটা ডেকে সোফার উপরে বসে ধ্যান করছেন। ভোর পাঁচটায় তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন। একটু পরে মিথুন চলে গেল। তারপর সকাল হলে ব্রেকফাস্টের সময় ওঁরা বলেছেন, "মহারাজ আজ এখানে জঙ্গলে মিথুন এসেছিল।" মহারাজ তখন বিস্ময়ে বললেন, "অ্যাঁ! মিথুন এসেছিল! আমি দেখতে চেয়েছিলাম, আমাকে ডাকলে না কেন?" ওঁরা বললেন, "আপনি তো ধ্যানে বসে ছিলেন... ।" "আরে ধ্যান তো পরেও করতে পারতাম! মিথুন এল, তোমাদের আমাকে ডাকা উচিত ছিল।" তিনি মিথুন দেখতে এত ব্যগ্র ছিলেন। ভেরি ইন্টারেস্টেড।

আমি সারদাপীঠে থাকার সময় 'অ্যানিম্যাল হিস্ট্রি' নামে 'জিওগ্রাফি সার্ভিস অফ ইন্ডিয়া' একটা সিরিজ বের করেছিল। সেটা আমার কাছে ছিল। ভূতেশানন্দজী যেই শুনেছেন অমনি আমাকে বলে পাঠালেন, "তোমার কাছে যে সিরিজ আছে আমাকে দেখাবে?" দেখিয়েছিলাম। কী আনন্দ তাঁর! ছাত্রদের মতো নতুন নতুন জিনিস দেখা আর শেখার আনন্দ তাঁর মধ্যে দেখেছি।

আমি আলং-এ গিয়ে ওখানে সাধুনিবাস করেছিলাম। সামনে বারান্দা, পিছনে একটা ডেক। ভূতেশানন্দজী ওই ডেকে বসে ধ্যান করতেন। ডেকের সামনে একটা পাহাড়। ওখানে বসে কেউ ধ্যান করলে আর কেউ সেখানে যেতে পারে না। নিস্তব্ধ, নিরিবিলি একটি জায়গা। ওখানে যতক্ষণ ইচ্ছা যে-কেউ ধ্যান করতে পারেন। মহারাজ চার-পাঁচ দিন ছিলেন। ওই ডেকে বসে তিনি পাহাড়ের সামনে ধ্যান করতেন। ওখান থেকে ফেরার সময় মহারাজ আমাকে বলছেন, "শ্রীনিবাস, এই ডেকটাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া যায় না? খুব ভাল দেখতে। ধ্যান করার জন্য খুব ভাল জায়গা।" শুনে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম।

এরকম কত ঘটনা আছে। আর একটি ঘটনা

।১০।

খুব সুন্দর। ১৯৯৯ সালে নারায়ণপুরে মহারাজ গিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রম থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার দূরে একটি গ্রাম আছে, যেখানে পূর্ববাংলার রিফিউজিরা মিলে বিরাট একটা কলোনি বানিয়েছে। সেখানে বহু দরিদ্র দিনমজুরের বাস। তারা শুনেছে মহারাজ দীক্ষা দিচ্ছেন নারায়ণপুরে। দীক্ষা নেওয়ার তাদের তীব্র ইচ্ছা কিন্তু আসতে পারছে না। কারণ তারা একদিন কাজ না করলে অন্ন জুটবে না এমনই তাদের অবস্থা। আমরাই বা এত দূরে তাদের কাছে যাব কী করে, কোনও বাসেরও ব্যবস্থা নেই। তবু আমরা বললাম, "আমরা বাসের ব্যবস্থা করব, তোমরা চলে এসো।" তারা বলল, "যেতে যেতে চার-পাঁচ ঘণ্টা লেগে যাবে। তারপর রাত কাটাতে হবে। সকালে উঠে দীক্ষা নিয়ে পরের দিন বিকেলে ফেরা, দুদিন লাগবে। আমরা টাকা পয়সা কোথায় পাব? খাওয়া-দাওয়া কী করে হবে? আপনারা না হয় এক-দুবেলা খাইয়ে দিলেন, তারপর এখানে এসে কী হবে? তাই আমরা যাব না।" মহারাজ সব জানতে পেরে বললেন, "আমি যাব। ওখানে আমাকে নিয়ে চলো।" ওখানে গিয়ে সবাইকে দীক্ষা দিলেন। এটা আমার খুব মনে পড়ে। এরকমই ছিল তাঁর সব উদ্যোগ। অন্যদের কষ্ট খুব অনুভব করতেন, হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন খুব সহজে। এরকম বহু ঘটনা তাঁর জীবন জুড়ে।

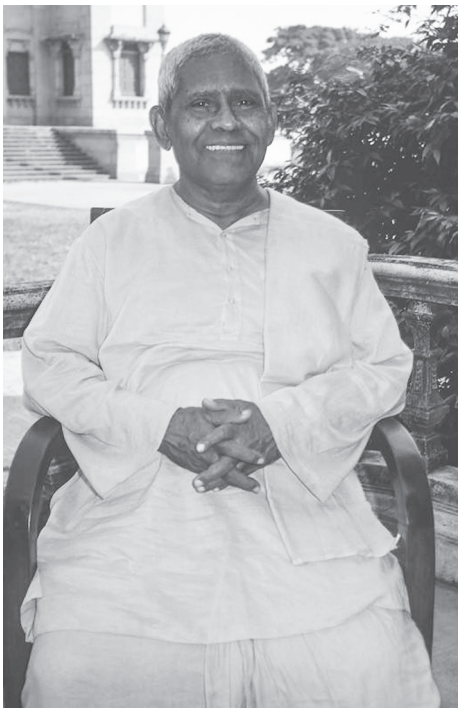

আর-একবার এক ভক্ত মহারাজকে বলেছেন, "মহারাজ আপনার এক ভক্ত আছেন, তাঁর আপনার প্রতি অগাধ ভক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি খুব ভালবাসা ও বিশ্বাস। তিনি তাঁর সব ঘরে স্পিকার লাগিয়ে একটি ক্যাসেট চালিয়ে রাখেন যেখানে ভোর পাঁচটা থেকে রাতে ঘুমনোর আগে পর্যন্ত বাজতে থাকে 'ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়'। সারাদিনে ঘরের যেখানেই যাওয়া হয় একই নাম শোনা যায়। আচ্ছা মহারাজ, সারাদিন ওরা এত রামকৃষ্ণ নাম জপ করছে তাহলে কি রামকৃষ্ণের কাছে পৌঁছে যাবে?" মহারাজ নিঃশব্দে এক মিনিট সময় নেন এবং বলেন, "হ্যাঁ পৌঁছে যাবে; ক্যাসেটটা পৌঁছে যাবে।" মহারাজ এমনই মজার মানুষ ছিলেন।

তিন বছর সারদাপীঠে ছিলাম, প্রতিদিনই আরতির পরে তাঁর কাছে আমরা যেতাম। কাছে বসলে তিনি অনেক কথা বলতেন। একটা ব্যাপার আমরা দেখতাম—তাঁর মেধাশক্তি। অদ্ভুত তাঁর স্মৃতিশক্তি। বম্বেতে তাঁর যখন বাইপাস সার্জারি হয় তখন তাঁর প্রায় নব্বই বছর বয়স। ডাক্তার নাকি বলেছিলেন, "আমি কনফিডেন্ট, অপারেশন

।১১।

ভালই হবে। তবে মহারাজ, আমি গেস করছি আপনার কোনও না কোনও অঙ্গে এফেক্ট করবে, হয়তো মেমারিতে এফেক্ট করবে।" তখন মহারাজ বলেন, "আমি এত তো কষ্ট পাচ্ছি, এফেক্ট করলেও অপারেট করো।" অনেক ঘণ্টার অপারেশন হল। তারপর তাঁকে কেবিনে নিয়ে আসা হল। তাঁর কনসাসনেস ঠিক হতে দু-এক ঘণ্টা লাগল। সবাই ভেবেছিল আগে কিছু খাওয়াবে কিন্তু মহারাজ একটি কাগজ ও পেনসিল চাইলেন। সবাই অবাক, পেনসিল-কাগজ এত বড় অপারেশনের পর! কী করে চাইছেন! তবুও দেওয়া হল। তিনি বড় বড় করে লিখলেন, "My memory is alright."

স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ বলতেন, মন যারা ঠিক ঠিক কাল্টিভেট করে থাকে তাদের সবসময় স্মৃতিশক্তি ঠিক থাকে, কোনওদিন নষ্ট হয় না। ভূতেশানন্দজী এরকম এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

সকলের মতো আমারও তাঁকে দেখে সবসময় মনে হত, আমাদের পরম্পরায় তিনি একজন আদর্শ সন্ন্যাসী। ঠাকুর-মা-স্বামীজী যেমন চেয়েছিলেন—আমাদের জীবন চারটি যোগের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে—তাঁর জীবনটি ছিল ঠিক তেমন। কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান-যোগ—চারটি যোগেই তিনি পারঙ্গম ছিলেন। যেমন বিদ্বান তেমন ভক্তিমান, তেমনই কর্মী। বিরাট বিরাট কর্মযজ্ঞ করেছেন তিনি। রাজকোট, বেলুড় মঠ, কাঁকুড়গাছি—যেখানেই থেকেছেন বড় বড় কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন কর্মযোগী, বুদ্ধিযোগী, ভক্তিযোগী এবং বিদ্যাত্মজ্ঞানযোগী।

একবার মহারাজ ইটানগরে গেছেন—সম্ভবত ১৯৬৭ বা ৬৮ সালে। রাতে সাধুদের ক্লাসে একজন সাধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মহারাজ, আপনাদের সময়ে তপস্যা করার জন্য আপনাদের ছুটি দেওয়া হত। আমরা এখন তপস্যার জন্য ছুটি পাই না। আমাদের কি তপস্যার দরকার নেই?" উত্তরে মহারাজ বললেন, "তপস্যার দরকার নেই কেউ বলতে পারে? তপস্যা এখনও দরকার, তখনও দরকার ছিল, ভবিষ্যতেও দরকার। তুমি বলছ ছুটির কথা। এখন মঠ-মিশনে আমি দেখছি সবাই বছরে একমাস ছুটি পায়-ই পায়। একমাস ছুটিতে তোমরা এখানে ওখানে না ঘুরে সোজা হৃষীকেশ কিংবা উত্তরকাশী যাবে। যেতে হয়তো দেড়দিন এবং আসতে দেড়দিন লাগবে। আর সাতাশ দিন থাকবে। চিন্তন করো। আমি যা করেছি। আমি দুবছর তপস্যা করার সময় আত্মচিন্তন করেছি। আত্মচিন্তনের দুবছর পরে ভাবলাম, দেখা যাক মনটা কীরকম আছে। আমার নিয়ন্ত্রণে আছে কী না! মনকে বললাম, 'তুমি যা ইচ্ছা চিন্তা করতে পারো।' মন কোনও চিন্তা করল না। শুধু ঠাকুরের চিন্তা করতে লাগল। এরকম তোমরাও পারবে। তোমাদেরও আত্মচিন্তন করা উচিত। এটাই ঠিক ঠিক তপস্যা। এখন কী করছ তোমরা? ছুটি পেলে অনেক আশ্রম ঘুরছ। আশ্রম ঘোরা খারাপ নয়। কিন্তু আত্মচিন্তনের তুলনায় ওটা ঠিক তপস্যা নয়।" মহারাজ এইভাবে আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দিতেন।

এমন এক মহাপুরুষের ১২৫ তম জন্মবর্ষ আমরা পালন করছি। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি—আমাদের এমন মহাপুরুষের সংস্পর্শ তুমি বারবার করাও, আমাদের মানুষ করো।

মহারাজের কাছে প্রার্থনা জানাই—আমাদের জীবনে যেন তাঁর উপদেশ কার্যকরী হয়, আমাদের যেন জীবনে আনন্দ ও শান্তি প্রাপ্তি হয়, যেন আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে যেতে পারি। নি

।১২।